

তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ

মুসলিম জীনে এর প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী



তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ
মুসলিম জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ
মুসলিম জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা

প্রকাশক

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১০৭

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০-৮০০৯০০।

التصفيية والتربية وحاجة المسلمين إليهما

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني

الترجمة البنغالية: محمد عبد المالك

الناشر: حديث فاؤন্ডেশন بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪১ হি.

ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/জানুয়ারী ২০২০ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

২০ (বিশ) টাকা মাত্র

Tasfiah o Tarbiyah : Muslim Zibone er Proyozoniota by **Nasiruddin Albani**, Translated into Bengali by **Muhammad Abdul Malek**. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রকাশকের নিবেদন

এক সময় মুসলিম উম্মাহ দোর্দণ্ড প্রতাপে সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিল। শৌর্য-বীর্যে তারা ছিল খ্যাতির শীর্ষে। অতঃপর মৌলিকভাবে তিনটি কারণে মুসলমানরা পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। (১) তাওহীদী আক্বীদা দুর্বলকারী বিভিন্ন অনৈসলামী দর্শনের অনুপ্রবেশ। (২) ঈমান ও আমলের মধ্যে ঐক্যতান শিথিল হওয়া। (৩) জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষকামিতা। দুনিয়ার মোহে পড়ে তারা পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হ'ল। ফলে মুসলিম জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তির সুদৃঢ় দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হ'ল। শত্রুরা তাদের ঘাড়ে চেপে বসে ছড়ি ঘুরাতে লাগল। লাঞ্ছনা ও দুর্গতি যেন তাদের ললাট লিখনে পরিণত হ'ল। এ অবস্থা এখনও অব্যাহত আছে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯) মুসলমানদের এ দুর্দশা ও দুর্গতির হাদীছভিত্তিক কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। তিনি আবূদাউদ-এর ৩৪৬২ নং হাদীছের আলোকে মুসলমানদের পতনের দু'টি মৌলিক কারণ চিহ্নিত করেন। ১. বিভিন্ন কৌশলে সূদ সহ নানাবিধ হারাম লেনদেনে জড়িয়ে পড়া। ২. দুনিয়ার মোহে বিভোর হয়ে পরকালকে ভুলে যাওয়া। এর চিকিৎসা হ'ল التصفية (পরিশুদ্ধিতা) ও التريية (পরিচর্যা)-এর মাধ্যমে দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। শুধু কথার ফুলঝুরিতে নয়; বরং আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে দ্বীনের দিকে ফিরে আসা। আর দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন অর্থই হল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং আমরা যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মকে কুরআন ও সুন্নাহ নির্ভর ছহীহ আক্বীদার উপর গড়ে তুলতে পারি তাহ'লে মুসলিম উম্মাহ তার পতন দশা থেকে মুক্তি লাভ করে অতীতের সেই সোনালী ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে' (রা'দ ১৩/১১)।

সেই কাজক্ষিত লক্ষ্য সাধনের জন্য ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ বইটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ)-কে সেটি অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি সাবলীলভাবে বইটি অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি প্রথমত মাসিক ‘আত-তাহরী’কে দুই কিস্তিতে (ডিসেম্বর’১৯-জানুয়ারী’২০) প্রকাশিত হয়। এক্ষণে এর গুরুত্ব ও আবেদন বিবেচনায় সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বইটি ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন’ গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। এটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উক্ত গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে যদি একজন পাঠকের মনেও নবজাগৃতির স্পৃহা সৃষ্টি হয় এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মানসিকতা তৈরী হয় তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!!

‘তাছফিয়াহ’ (পরিশুদ্ধিতা) ও ‘তারবিয়াহ’ (পরিচর্যা)

হামদ ও ছানার পর আপনারা সবাই জানেন যে, আজকের দিনে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা এতটাই খারাপ ও নিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে যে তার থেকে নিচে নামা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা আজ অন্যদের লাঞ্ছনা ও দাসত্বের শিকার। মুসলিম বিশ্বের সবক’টি দেশের উপর দুঃখজনকভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসা এই লাঞ্ছনা ও দাসত্বের অনুভূতি আমাদের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে রয়েছে, বিধায় মুসলমানদের আম-খাছ সকল সভা-সমাবেশ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে হরহামেশাই এহেন অপমান ও দুর্দশার কারণ নিয়ে আমরা পরস্পরে আলোচনা করছি। আমাদের এতটা হীন ও লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থায় নেমে যাওয়ার গূঢ় রহস্য উদঘাটনেও আমরা তৎপরতা চালাচ্ছি। সাথে সাথে এহেন লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার ও প্রতিকারের উপায় নিয়েও আমরা কথাবার্তা বলছি।

তবে আমাদের মতামত নানা মুনির নানা মতে পর্যবসিত হচ্ছে এবং দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা আলাদা রূপ নিচ্ছে। প্রত্যেকেই এমন এমন কর্মপন্থা বা পদ্ধতি এনে হাযির করছেন, যাকে তিনি এই সমস্যার সমাধান এবং সঙ্কটের দাওয়াই ভাবছেন।

আমি মনে করি, উম্মতের এহেন সঙ্কটের কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোচনা করেছেন এবং তাঁর কিছু হাদীছে এর বিবরণ যেমন দিয়েছেন, তেমনি সমাধানের উপায়ও বলে গেছেন। তারই একটি হাদীছ নিম্নে তুলে ধরা হ’ল :

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذَلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ-

‘যখন তোমরা ‘ঈনা’ পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে খুশী থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন

না'।^১

সংক্ষিপ্ত পরিসরে হ'লেও হাদীছটিতে আমরা প্রসার লাভকারী সেই রোগের উল্লেখ লক্ষ্য করছি, যা সকল মুসলিম সমাজকে গ্রাস করেছে। নবী করীম (ছাঃ) হাদীছটিতে নমুনা হিসাবে দু'টি রোগের কথা উল্লেখ করেছেন। এমন নয় যে, তিনি অধঃপতিত মুসলিম জাতির জন্য কেবল এই দু'টি রোগকেই দায়ী করেছেন।

প্রথম প্রকার রোগ :

সজ্ঞানে অপকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে মুসলমানদের কিছু কিছু হারামে জড়িয়ে পড়া হচ্ছে প্রথম প্রকারের রোগ। এটাই লুকিয়ে আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি 'যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে'-এর মধ্যে। ঈনা এক প্রকার বেচাকেনা যা ফিক্‌হের গ্রন্থগুলোতে একটি পরিচিত আলোচ্য বিষয়। এই হাদীছে তা হারাম হওয়ার নির্দেশ মেলে। তা সত্ত্বেও সাধারণ লোক তো দূরের কথা কিছু আলেমও তার বৈধতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

ঈনা পদ্ধতির বেচাকেনা :

একজন ক্রেতা কোন ব্যবসায়ীর নিকট থেকে কোন পণ্য নির্দিষ্ট মেয়াদে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে কিনবেন। তারপর এই ক্রেতা বিক্রেতা সেজে প্রথম বিক্রেতার নিকট ঐ পণ্য প্রথম ক্রয়মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করবেন। এবার প্রথম বিক্রেতা যিনি ক্রেতা সাজছেন, তিনি অপেক্ষাকৃত কমে পণ্যটি কিনে তার মূল্য নগদে প্রথম ক্রেতাকে পরিশোধ করবেন এবং প্রথম ক্রেতা যিনি পরে বিক্রেতা সেজেছেন তিনি প্রথম যে মূল্যে কিনেছিলেন তা ঋণসূত্রে কিস্তিতে কিস্তিতে প্রথম বিক্রেতাকে পরিশোধ করবেন। উদাহরণস্বরূপ একটি মোটরগাড়ি দশ হাজার লিরায় বাকীতে বিক্রয় করা হ'ল; এবার ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার নিকট আট হাজার লিরা নগদ মূলে তা বিক্রি করে দিল। ফলে মোটরগাড়ি প্রথম বিক্রেতার নিকটেই থেকে গেল।

১. আব্দাউদ হা/৩৪৬২; ছহীহাহ হা/১১; ছহীছুল জামে' হা/৪২৩। (আরবী 'যুল্লুন' ও 'যিল্লাতুন'-এর বাংলা 'লাঞ্জনা'। অপমানজনক দূরবস্থা ও দুর্গতিকে লাঞ্জনা বলে। দ্র. আবদুল ওয়াদুদ, ব্যবহারিক শব্দকোষ)।-অনুবাদক।

মাঝখান থেকে প্রথম ক্রেতা বিক্রেতা সেজে যে আট হাজার লিরা নগদ নিল তার উপর দুই হাজার লিরা নির্দিষ্ট মেয়াদে অতিরিক্ত দেওয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হ'ল।^২

মেয়াদভিত্তিক এই অতিরিক্ত অর্থই তো সূদ। যে মুসলিমই সূদ হারাম সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত এবং রাসূলের হাদীছ শুনেছে তার জন্য ফরয হবে ঈনা পদ্ধতির বেচাকেনায় যদবধি অতিরিক্ত অর্থদানের কথা থাকবে তদবধি তাকে হালাল গণ্য না করা। কেননা এতো খোলাখুলি সূদ। তথাপি কিছু মানুষ এ পদ্ধতিকে মুবাহ ভাবছেন। কারণ এটি বেচাকেনার ধারায় সম্পাদিত হয়েছে। তারা সাধারণভাবে যে সকল আয়াত ও হাদীছে বেচাকেনা হালালের উল্লেখ আছে সেগুলো দ্বারা দলীল-প্রমাণ দিয়ে থাকেন। যেমন সূদ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ‘আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন’ (বাক্বারাহ ২/২৭৫)। তারা বলছেন, এ তো বেচাকেনাই। সুতরাং কম-বেশী যাই হোক তাতে কোন দোষ নেই।

কিঞ্চ প্রকৃত সত্য তো এই যে, দশ হাজার লিরায় যিনি বাকীতে কিনেছেন, তারপর আট হাজার লিরায় নগদে বেচেছেন, তার এ কারবারের পেছনে মূলত তার ঐ আট হাজার লিরাই নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এও জানেন যে, এই প্রথম বিক্রেতা যে কিনা তার ধারণায় মুসলিম, সে অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আট হাজার লিরা পরিশোধের বিনিময়ে আট হাজার লিরা নগদে দেবে না। তাই উভয়েই বেচাকেনার নামে হিলা-বাহানা খাটিয়ে এই অতিরিক্ত অর্থ হালাল করেছে।

জেনে রাখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'লেন প্রথমত মানব জাতির জন্য আল্লাহর বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ‘আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল

২. তুর্কী মুদ্রাকে লিরা বলা হয়।

করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে’ (নাহল ১৬/৪৪)।^১

দ্বিতীয়ত তিনি মুমিনদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। যেমন আল্লাহ বলেন, بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ‘তিনি মুমিনদের প্রতি দয়াশীল, করুণাময়’ (তওবা ৯/১২৮)। তাঁর দয়া ও অনুকম্পারই একটি অংশ, মানব জাতির জন্য শয়তানের গোপন চক্রান্ত ও হিলা-বাহানা সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করা। তিনি তাঁর অনেক হাদীছে আমরা যাতে শয়তানের চক্রান্তজালে ফেঁসে না যাই সেজন্য বারবার সাবধান করেছেন। তারই একটি আমাদের আলোচ্য হাদীছ: ‘যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে’ অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন যখন তোমরা তা বেচাকেনার নামে অপকৌশল খাঁটিয়ে হালাল করে নিবে। কেননা এ বেচাকেনা তো আসলে অসত্যের উপর পর্দা আরোপ এবং অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ঋণ প্রদান, যা কিনা খোলাখুলি সূদ। তাই এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশিত হারামকে হালাল করার অপকৌশলে মেতে ওঠা থেকে সাবধান করেছেন। হারামকে হারাম জেনে তাতে লিগু কোন মুসলিম থেকে এভাবে কৌশল খাটিয়ে হারামকে হালালকারী মুসলিম বেশী সর্বনাশা। কারণ জেনেশুনে হারামে লিগু ব্যক্তি যেহেতু জানে যে, সে যা করছে তা হারাম, তাই কোন একদিন তওবা

৩. আলোচ্য আয়াত ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইসলামের সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা প্রদান এবং ব্যবহারিক বা প্রায়োগিকভাবে তা দেখিয়ে দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত, মু’আমালাত বা পারস্পরিক কারবার, আইন-বিচার, রাজ্য শাসন, মু’আশারাত বা সমাজ পরিচালনা, চরিত্র বা আদব-আখলাক ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন, যা হাদীছ বা সুন্নাহ নামে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা দ্বারাই তিনি আল্লাহর বিধানকে সুস্পষ্ট করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, *تَوَمَّرَا حَالَاتِ آدَائِي كَمَا رَأَيْتُنِي أُصَلِّي* ‘তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ’ (বুখারী হা/৬৩১)। তিনি ওয়ু থেকে নিয়ে সালাম ফেরানো পর্যন্ত ছালাতের যাবতীয় নিয়ম-কানুন হাদীছে বলে গেছেন। ছাহাবাদের তিনি হাতে কলমে ছালাত শিখিয়েছেন। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে প্রথমেই ছালাত শিখাতেন। তাঁর তরীকাই কুরআনের তরীকা। আল্লাহ বলেন, *مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ* ‘যে রাসূলকে মানল সে আল্লাহকে মানল’ (নিসা ৪/৮০)। তাঁর তরীকা অমান্য করা কুফর এবং নিজেদের ইচ্ছামত তাতে নতুন কিছু সংযোজন বিদ’আত।-অনুবাদক।

করে নিজ রবের পথে ফিরে আসার সম্ভাবনা তার আছে। কিন্তু ভুল ব্যাখ্যার জন্যই হোক, কিংবা নীরেট মূর্খতাবশত হোক, অথবা অন্য যেকোন কারণেই হোক, নিজের খারাপ কাজ যার কাছে সুন্দর-সুশোভিত মনে হয় সে তো ভাবে যে, তার কাজে কোনই গলদ নেই। সুতরাং তার মনে যে একদিনের জন্যও আল্লাহর কাছে তওবা করার চিন্তা জাগবে না, তা একান্তই স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং খোলামেলা হারামে লিপ্ত ব্যক্তির তুলনায় চিন্তায় ও আক্বীদায় হারামকে হালাল গণ্যকারীর বিপদ বেশী। যে সূদ খায় এবং জানে ও বিশ্বাস করে যে তা সূদ, যদিও কুরআনের বাণী অনুসারে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত- তবুও তার বিপদ ঐ লোকের তুলনায় কম, যে হালাল বিশ্বাসে সূদ খায়। যেমন, যে মদ্যপায়ী মদকে হারাম বিশ্বাসে পান করে তার বেলায় আশা করা যায় যে, একদিন সে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসবে। কিন্তু যে মদ পান করে এবং কোন কায়দায় তা হালাল বলে বিশ্বাস করে সে প্রথমোল্লিখিত মদ্যপায়ী থেকে বেশী বিপদগ্রস্ত হবে। কেননা যতদিন সে আল্লাহর বিধানের অপব্যাখ্যায় মগ্ন থাকবে ততদিন তার তওবার সম্ভাবনা কল্পনাও করা যাবে না।^৪

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ হাদীছে ঈনা পদ্ধতির বেচাকেনা যে হারাম হওয়ার কথা বলেছেন, তা একান্তই উদাহরণ হিসাবে বলেছেন। হারামকে শুধু ঐ একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করার মানসে তিনি তা বলেননি। তিনি এ কথা দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, যত রকম হারামকেই একজন মুসলিম কোন পদ্ধতি খাড়া করে হালাল করবে তার ফল স্বরূপ আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত করবেন। আর মুসলিম সমাজে যখন সেই হারাম সমানে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তার কারণে গোটা মুসলিম জাতি লাঞ্চিত হবে।

দ্বিতীয় প্রকার রোগ :

শরী'আতসম্মত হবে না জেনেও আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণকৃত ফরযসমূহ ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র জাগতিক কাজে সকলে একজোট হয়ে লিপ্ত হওয়া। এ

৪. আমার (আলবানী) বক্তব্য হল, এরূপই বিদ'আত। এটা পাপের চেয়ে ভয়ানক। কারণ পাপী কোন অন্যায়কে পাপ জেনেই করে। কিন্তু বিদ'আতী ভালো মনে করেই বিদ'আত করে।

লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে খুশী থাকবে’ অর্থাৎ তোমরা জাগতিক ধন-সম্পদের পেছনে তোমাদের শ্রম-সাধনা ব্যয় করবে এবং আল্লাহ রূযী তালাশ করতে আদেশ দিয়েছেন বলে তার দোহাই দিয়ে রূযী তালাশে মশগূল হবে। মুসলিমরা এভাবে কেবলই দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকবে এবং আল্লাহর নির্দেশিত ফরয দায়িত্ব সমূহ ভুলে যাবে। তারা ক্ষেত-খামার, পশুপালন এবং অন্যান্য পেশা ও বৃত্তি নিয়ে পড়ে থাকবে। এসব কাজে লিপ্ত থাকার দরুন আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর যেসব দায়িত্ব পালন ফরয বা আবশ্যিক করেছেন তারা তা ভুলে যাবে। উদাহরণ হিসাবে তিনি এ হাদীছে আল্লাহর পথে জিহাদের কথা ভুলে যাওয়ার কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন, ‘যখন তোমরা ‘ঈনা’ পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে খুশী থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না’।

এ হাদীছ নবী করীম (ছাঃ)-এর নবুঅতের অন্যতম স্মারক। এ লাঞ্ছনা তো আজ আমাদের মাঝে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আফসোস! আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি! সুতরাং হাদীছে রোগ ও তার ফল হিসাবে লাঞ্ছনা বর্ণনার পর তার যে ওষুধ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন আজ তা গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমরা তো রোগের কারণগুলো বরণ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছি, এখন আমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে তিনি রোগের যে দাওয়াই বাতলিয়েছেন তা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কার্যকর করা।

তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যখন আমরা দ্বীন ইসলামের দিকে ফিরে যাব তখন আল্লাহ আমাদের থেকে এ অপমান ও লাঞ্ছনা তুলে নিবেন। লোকেরা এ হাদীছ বলবার পড়ে এবং তাঁর বাণী ‘তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না’ বলবার শুনে তাদের মনে ধারণা জন্মে যে, দ্বীনের

দিকে ফেরা তো একটা সহজ ব্যাপার। কিন্তু আমার ধারণায় এর থেকে কঠিন কাজ আর কিছু নেই। কারণ এই দ্বীনের প্রকৃত রূপ বা আসল সত্যকে বহু ক্ষেত্রে নানান ছুতো ও ফন্দি খাটিয়ে বদলে ফেলা হয়েছে। অনেকেই এ ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ধরতে সক্ষম। কিছু পরিবর্তন তো অনেকের কাছেই সুবিদিত। আবার এমন কিছু পরিবর্তন আছে যা কিছু লোক ধরতে পারলেও অধিকাংশ লোক তার সন্ধান জানে না। পরিবর্তনকৃত এসব মাসআলার কিছু ঈমান-আক্বীদার সাথে জড়িত এবং কিছু ফিক্বহের সাথে জড়িত।

লোকেরা মনে করে পরিবর্তিত এসব মাসআলা দ্বীনের অংশ, অথচ দ্বীনের সাথে এগুলোর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ইতিপূর্বে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত আমাদের থেকে বেশী দূরে যায়নি। এটিই প্রথম কারণ যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই হাদীছে বলেছেন, ‘যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে’।

দেখুন, ঈনা পদ্ধতির বেচাকেনাকে সকলে হারাম বলে মেনে নিতে পারেনি অথবা তা হারাম বলে সবার জানা নেই। এমনকি যেসব মুসলিম দেশ এখনও অনৈসলামী দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা তেমন একটা প্রভাবিত হয়নি, যেসব দেশকে আমরা ইসলামের আশ্রয়স্থল মনে করি- সেসব দেশের বহু আলেম ‘ঈনা’ পদ্ধতিতে বেচাকেনা বৈধ বলে ফৎওয়া দেন। অথচ এই বিক্রয় পদ্ধতির মধ্যে সূদ হালাল করার জন্য অপকৌশল ও ফন্দি খাটানো হয়েছে। এটি এ ধরনের অনেক উদাহরণের মাত্র একটি। ইসলামী ফিক্বহ চর্চাকারীরা এসব উদাহরণের সঙ্গে ভালো মত পরিচিত।

এ জাতীয় বেচাকেনা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক হারাম ঘোষণা এবং তাতে লিপ্ত হওয়া জাতিগত লাঞ্ছনার কারণ বলা সত্ত্বেও মুসলমানদের তাতে লিপ্ত হওয়ায় দ্বীনের পানে ফেরা যে সহজ নয়, এটি আমাদের সে দাবীরই ডজন ডজন উদাহরণের একটি।

এখন আমাদের আবশ্যিকীয়ভাবে নতুন করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দ্বীন বুঝতে হবে। মনে রাখা আবশ্যিক যে, কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছে কিছু বিষয় সুস্পষ্টভাবে হারাম বলার পরও কিছু আলেম সেগুলোকে মুবাহ ঠাওরে থাকেন

বলে যখন আমরা বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করি তখন তাদের সমালোচনা বা ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে আমরা তা করি না, বরং আমাদের উদ্দেশ্য মুসলিমদের কল্যাণ কামনা এবং তাদের সহ সকলের বিশেষ করে যারা ইসলামী ফিক্বহের সাথে জড়িত তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা। এছাড়া কারো কারো থেকে যে কারণেই হোক কিছু মাসআলায় যে বিচ্যুতি ঘটেছে তার প্রতিকার করা। সে প্রতিকার হ'তে হবে কুরআনের একটি আয়াতের দিকে ফেরার মাধ্যমে। আয়াতটি আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু তাকে আমলে নিতে আমাদের খুব কমই দেখা যায়। সেই আয়াতটি হচ্ছে, فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - 'অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' (নিসা ৪/৫৯)।

ফিক্বহ শাস্ত্র অধ্যয়নকারীরা জানেন যে, 'ঈনা' পদ্ধতির বেচাকেনাসহ আরও অনেক প্রকার বেচাকেনা নিয়ে আধুনিক কালের আলেম-ওলামা তো দূরের কথা, প্রাচীন কালের আলেমদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং এ যুগের আলেমরা এ জাতীয় মতভেদপূর্ণ মাসআলাসমূহ নিয়ে কী করবে সেটাই বড় প্রশ্ন। আমার যা জানা তাতে তাদের অধিকাংশই এ মতভেদ বহাল রাখা এবং পুরাতনকে তার পুরাতন অবস্থায় রাখার পক্ষে।

এমতাবস্থায় আমার জিজ্ঞাসা, তাহ'লে কীভাবে মুসলমানরা তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে? অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর কথা মতে এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা দ্বীনকে ধারণ করা। দ্বীনকে ধারণ করলেই কেবল এ লাঞ্ছনা ও দুর্গতি দূর হবে, নচেৎ নয়। তিনি বলেছেন, 'যখন তোমরা 'ঈনা' পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে খুশী থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না'।

এখন এর একমাত্র চিকিৎসা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এই দ্বীন যেমনটা সকলেই এবং বিশেষত ফিক্বহবিদরা জানেন যে সাংঘাতিকভাবে মতভেদপূর্ণ। অনেক লেখক বা আলোমের ধারণা এবং তারা বলেও বেড়ান যে, এই মতভেদ ফারঈ বা ফিক্বহ বিষয়ক অল্প কিছু শাখা-প্রশাখাগত মাসআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাদের কথা সঠিক নয়। বরং ফারঈ বা ফিক্বহ বিষয়ক মাসআলা ছেড়েও এ মতভেদ আক্বীদাগত বা মৌলিক মাসআলাতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। আমরা দেখি, আশ'আরী ও মাতুরিদীদের মধ্যে আক্বীদার বিষয়ে বড় রকমের মতভেদ রয়েছে। আবার এদের সাথে মু'তাজিলাদের আক্বীদারও অনেক পার্থক্য আছে। অন্যান্য ফিরক্বা বা দলের কথা আর নাই বা বললাম। আমাদের ধারণা মতে এরা সবাই মুসলিম এবং সবাই এই হাদীছের হুকুমভুক্ত 'আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না'। তাহ'লে কোন সে দ্বীন, যার পানে আমাদের ফেরা কর্তব্য? তা কি অমুক ইমামের বাতলানো মাযহাবী দ্বীন? তারপরও তো এখানে অনেক মাযহাব রয়েছে। আমরা না হয় মতভেদটা চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি যাদেরকে আমরা আহলুস সুন্নাহর মাযহাব বলি। তাহ'লে কোন সে দ্বীন আমাদের এই দুর্গতি থেকে উদ্ধার করতে পারবে? আমরা যেকোন একটা মাযহাবকে দেখলে সেখানে কম-বেশী এমন অনেক মাসআলা পাব যা সুন্নাহর বিপরীত; যদিও তন্মধ্যকার কিছু মাসআলা কুরআনের বর্ণনার পরিপন্থী নয়।

এজন্য আমি মনে করি, আজকের দিনে ইসলামের দাঈদের এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ অনুসন্ধানীদের ইখলাছের সঙ্গে যে সংস্কার হাতে নেওয়া আবশ্যিক তা এই যে, প্রথমতঃ তারা নিজেদের বুঝ এই মর্মে পাকাপোক্ত করবে যে, দ্বীন তাই যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সকল মুসলিম উম্মাহকেও তারা বুঝাবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছিলেন দ্বীন কেবল তাই। আর সকল ফক্বীহ এ কথায় একমত যে, আল্লাহ যে দ্বীন নাযিল করেছেন, তাকে প্রকৃত অর্থে বুঝতে হ'লে কুরআন ও সুন্নাহর অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে ইমামগণ (রাহেমাহুল্লুয়াহ

তা'আলা) উক্ত কথায় একমত। এটা আমাদের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ এবং তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকেও তাঁদের উপর অনুগ্রহ যে, তাঁরা তাঁদের প্রথম যুগের (সমকালীন) অনুসারীদের তাঁদের অনুসরণ ও তাক্বলীদ করতে এবং শরী'আতের মূল সূত্র কুরআন ও সুন্নাহকে ভুলে গিয়ে প্রতিটি মাসআলা-মাসায়েলে তাঁদের কথা চূড়ান্ত গণ্য করা থেকে সাবধান করে গেছেন। অথচ তাঁদের তৎকালীন অনুসারীরা কিন্তু বড় বিদ্বান ছিলেন।

প্রিয় পাঠক! আমাদের ইমামদের সকল কথা যেই একটি বাক্যকে ঘিরে আবর্তিত সেই বাক্যের অতিরিক্ত কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন হবে না। তাঁদের সকলের থেকেই ছহীহ-শুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে, **إِذْ** 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব'।^৫

এখন তাঁদের অনুসরণের জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এই একটি কথাই যথেষ্ট। এটা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, ঐসকল ইমামের প্রত্যেকেই কোন হাদীছ তাঁর ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের বিপরীত হ'লে তাঁর অনুসারীদের হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে যেমন তাঁর নিজের কল্যাণ কামনা করেছেন, তেমন মুসলিম উম্মাহ ও তাঁর অনুসারীদেরও কল্যাণ কামনা করেছেন। তাদের এ বক্তব্য এখন কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার পথ খুলে দিবে।

আমরা এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। এসব উদাহরণ আমাদের শারঈ মাদরাসা, কলেজ ও অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বইগুলোতেই মজুদ আছে। একটি মাযহাবে আছে, ছালাত আদায়কারী ছালাত আরম্ভের শুরু থেকে তার দু'হাত ঝুলিয়ে রাখবে, হাত বাঁধবে না। কেন এ প্রবণতা? কারণ এমনটাই মাযহাব!! ছালাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাত পেঁচিয়ে ধরেননি মর্মে হাদীছ বিশারদদের কেউই একটা হাদীছও পান নাই।

৫. মুহাম্মাদ আমীন ইবনু আবেদীন দামেশকী (১১৯৮-১২৫২ হি.), রাদ্দুল মুহতার (বৈরুত : দারুল ফিকর ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭ পৃ.; আব্দুল ওয়াহহাব শারানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হি.) ১/৩০ পৃ.।

এমনকি যঈফ কিংবা জাল হাদীছও না। দু'হাত ঝুলিয়ে রাখার হাদীছের কোন অস্তিত্বই নেই। তারপরও তা মুসলিমদের কোন কোন মাযহাবে আছে। এটাই কি তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) আনীত সেই ইসলাম, যার দিকে তিনি আমাদের ফিরে যেতে বলেছেন? আমি জানি যে, আপনাদের কেউ কেউ বলবেন, এতো ফিক্কাহী শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা। আবার কেউ কেউ আর এক ডিগ্রি নিচে নেমে বলবেন, এতো একটা তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়, এ নিয়ে এতো মাথা ব্যথার কী আছে? আমি কিন্তু বিশ্বাস করি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীন ও ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার কোনটাই সামান্য ও তুচ্ছ নয়।

আমরা বিশ্বাস করি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে আমাদের প্রথমেই দ্বীন হিসাবে ভাবা ফরয। অবশ্য শরী'আতের দলীলে সেগুলোকে ওযন বা যাচাই করতে হবে। তাতে যেটা ফরয প্রমাণিত হবে সেটাকে ফরয এবং যেটা সুন্নাত হবে সেটাকে সুন্নাত মানতে হবে। কিন্তু কোনটা মুস্তাহাব বা নফল হ'লে তাকে আমরা 'তুচ্ছ' বা 'ফলের খোসা' নাম দিতে পারি না। এটা ইসলামী আদব-কায়দা বা ভদ্রতার কোন পর্যায়ে মোটেও পড়ে না। আক্ষরিকভাবে যদি আমি তাদের কথা মেনেও নেই তবুও তো এ কথা অবশ্যই সত্য যে, ফলের শাঁস খোসা ছাড়া হেফাযত করা যায় না।

ছালাতে হাত ঝুলিয়ে রাখার মত একটি আমল কী করে মুসলমানরা অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে? অথচ সুন্নাহর প্রতিটি গ্রন্থে একের পর এক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধতেন। এটা কি ইমামদের কথা- 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব'-এর বিরোধিতা করে তাঁদের অন্ধ অনুকরণ এবং জ্ঞানের বন্ধাত্ব নয়?

এই সুস্পষ্ট উদাহরণে কেউ কেউ হয়তো সঙ্কষ্ট নাও হ'তে পারে। তাই আমি আরেকটা উদাহরণ টানছি: কিছু ফিক্কাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মদ দুই প্রকার। এক প্রকার যা আগুর থেকে উৎপাদিত। এ ধরনের মদ কম-বেশী যাই পান করা হোক হারাম। আরেক প্রকার মদ যা আগুর বাদে যব, চাউল/ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি অন্য কোন কিছু থেকে উৎপাদিত। আজকের যুগে তো কাফেররা শিল্প-কারখানায় অনেক ভাবে অনেক নামে অনেক প্রকার মাদকদ্রব্য তৈরি

করছে। এ ধরনের সব মদ হারাম নয়। এর মধ্যে যেগুলো নেশার উদ্বেক করে কেবল সেগুলো হারাম।^৬ ফিক্বহের বইগুলোতে বারবার এ কথা কেন লেখা হচ্ছে?!

আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেকেই এর নানা রকম উত্তর হাযির করে। অন্য কোন কারণে নয়, বরং এজন্য যে, মুসলিম ইমামদের একজন ইমাম (ইমাম আবু হানীফা রহঃ) ইজতিহাদ করে এ কথা বলেছেন! অথচ আমাদের মায়হাব ও মাশরাব আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও আমরা সবাই হাদীছের কিতাবগুলোতে হরহামেশা ছহীহ সনদযুক্ত এসব হাদীছ পড়ি, مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ, 'যার বেশী মাত্রায় নেশা আনয়ন করে তার স্বল্প মাত্রাও হারাম'^৭ كُلُّ مُسْكِرٍ 'যাবতীয় নেশার দ্রব্য মদ এবং সকল মদই হারাম'^৮

তাহ'লে এমন ভয়াবহ কথা দ্বারা কেন সেসব মানুষকে মাদকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, যারা কিনা পাপাচারের খাদের কিনারে অবস্থান করছে? এমনকি তারা কার্যত তার মধ্যে ডুবে আছে? তারা তো এখন আগুর বাদে অন্য শ্রেণীর মদ স্বল্প মাত্রায় এই দলীলে মযাসে পান করছে যে, অমুক ইমাম এ কথা বলেছেন, আর তিনি তো একজন আলেম ফাযেল (মহৎ বিদ্বান) মানুষ। আফসোস! মদ হালাল করার জন্য কী জঘন্য দলীল!!

আমরাও বিশ্বাস করি যে, তিনি একজন আলেম ফাযেল মানুষ। তবে আমাদের উভয়ের বিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য এই যে, আমরা ভুলে যাই না যে, আলেম ফাযেল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভুলের উর্ধে নন। কিন্তু তারা এ সত্যকে ভুলে যান। ফলে তারা তাদের ইমামের কথার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডনে সদাই চেষ্টা করতে থাকেন। তাদের কেউ কেউ মুসলিমদের মধ্যে মাদকের প্রসার ঘটাতে এ কথাকে পুঁজি করেন। আবার অনেকে মানহানি থেকে ইমামকে সুরক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁর কথা খণ্ডনে নয়।

৬. হিদায়া, কিতাবুল আশরিবা বা পানীয় অধ্যায় দেখুন।

৭. আব্দাউদ হা/৩৬৮:১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৩; ইরওয়া হা/২৩৭৫।

সম্ভবত আপনাদের অনেকের জানা আছে যে, ‘মাজাল্লা আল-আরাবী’ নামে একটি পত্রিকা অনেক দিন আগে তাদের এক লেখকের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সেই প্রবন্ধকার আঙ্গুর ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য থেকে উৎপাদিত মাদক গ্রহণ হালাল বলে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তা প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আজকের দিনে যেসব মদ সুপরিচিত তার অধিকাংশই আঙ্গুর থেকে উৎপাদিত নয়। (কাজেই সেগুলো স্বল্প মাত্রায় পান করলে তাদের মতে কোন অন্যায় হবে না।) ‘মাজাল্লা আল-আরাবী’ পত্রিকা তার প্রবন্ধে মুসলমানদের জন্য আধুনিক মাদক দ্রব্যাদি ইচ্ছামত পান মুবাহ করে দিয়েছে। এ মুবাহকরণের পেছনে তার দলীল: ‘যা তোমাকে নেশাগ্রস্ত করে তা পান কর না’। (অতএব যা নেশাগ্রস্ত করে না তেমন নেশার দ্রব্য ইচ্ছামত পান করো।)

আর স্বল্পমাত্রাও একটা আপেক্ষিক বিষয়। কেননা বাস্তবে আমরা সবাই জানি, পয়লা ফোঁটা টেনে আনে দ্বিতীয় ফোঁটাকে; অনুরূপভাবে তৃতীয় ফোঁটা টেনে আনে চতুর্থ ফোঁটাকে। এভাবেই পানক্রিয়া চলতে থাকে পুরোমাত্রা পর্যন্ত। যে স্বল্প মাত্রায় নেশা হবে না তার কোন সীমা ও নিয়ম-নীতি নির্ধারণ সম্ভব নয়। ফলে পান করতে করতে যে মাত্রায় নেশা এসে যায় পানকারী এমন বেশী মাত্রায় পান করে বসে। (আবার দেখা যায়, একজনের অল্পতেই নেশা হয় তো অন্যের তার দ্বিগুণ মাত্রায়ও নেশা হয় না।)

কিন্তু আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত ও অকাট্য হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও এ জাতীয় বাতিল কথা কিভাবে ফিক্‌হের বইগুলোতে স্থান পেল এবং থেকে গেল? কেন আমরা একজন ধান্কাবাজ লেখককে তার বাতিল কথা প্রসারের সুযোগ করে দিচ্ছি? তার উপর নিজের মিশন ও প্রাসাদ খাড়া করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি? কি করেই বা তিনি মুসলমানদের জন্য এ কথা বলে হারাম পানীয় হালাল করার সুযোগ করে দিচ্ছেন যে, তুমি নেশা উদ্বেককারী বস্তু পান করো না এবং পান করলে অল্প পান কর, বেশী পান করো না।

যে ব্যক্তি এ কথা লিখেছে হ’তে পারে সে ধান্কাবাজ; আবার হ’তে পারে বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী। কিন্তু তার ইচ্ছা ব্যক্তিবিশেষের তরীকা বা মাযহাব

অনুসরণ। তাই সে ডেকে বলে, 'হে লোকসকল! মদ পানের ক্ষেত্রে তোমরা মুসলমানদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করো না। কেননা এক্ষেত্রে মুসলমানদের একজন সম্মানিত ইমামের মত রয়েছে, যিনি তাদের জন্য এই পানীয় মুবাহ (বৈধ) করে গেছেন। কাজেই আমরা তা কেন হারাম করব? ঐ লেখকের নিয়ত এমনটাও হ'তে পারে।

কিন্তু আমাদের কি হ'ল যে একজন বিখ্যাত সিরীয় আলিমকে দেখি, ঐ লেখকের লেখার প্রতিবাদ করতে গিয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। কিন্তু তাতে তিনি প্রতিবাদের নামে একেবারে লেজেগোবরে দশা করে ছেড়েছেন। একবার তিনি ঐ লেখক যে ইমামের কথাকে ভিত্তি করেছেন তাকে ভরপুর সমর্থন করেছেন তো আরেকবার সেসকল হাদীছের অবতারণা করেছেন যার কিছু আমরা তুলে ধরেছি যাতে ঐ লেখক এবং লেখক যে ইমামের কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তার বাতিল হওয়ার কথা রয়েছে।

কেন আমরা এই আলিমকে তার মত প্রকাশে এত দ্বিধাম্বিত দেখছি? তার কারণ, কথাটি একজন মুসলিম ইমামের বলে তিনি তাকে পবিত্র ভাবছেন। তার ধারণায় এই ইমাম তো প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে কিংবা অজ্ঞতা থেকে কথাটি বলেননি। (কাজেই তার কথার সত্যতা কোন না কোন ভাবে আছে।) আমি তার সাথে যোগ করছি, নাফসানী খাহেশ পূরণ কিংবা অজ্ঞতা থেকে কথাটি তিনি বলেননি তা ঠিক আছে, কিন্তু তিনি কি তার ঐ ইজতিহাদে ভুলের উর্ধ্বে বিবেচিত হবেন, যে ইজতিহাদ তিনি লেখকের দাবী মতে নাফসানী খাহেশ পূরণ কিংবা অজ্ঞতা থেকে করেননি? আমরা সবাই বলব, 'না'। আমাদের সবাই এক্ষেত্রে স্মরণ করব রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি **إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ** -এর উক্তি **فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ**, **وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ**, 'যখন বিচারক ইজতিহাদ বা গবেষণা করে বিচার করবেন এবং তাতে তিনি সঠিক রায় দিবেন তার দু'টি ছওয়াব মিলবে। আর যখন ইজতিহাদপূর্বক বিচার করতে গিয়ে তিনি ভুল করবেন তার একটি ছওয়াব মিলবে'।^৯

৯. বুখারী হা/৭৩৫২; মুসলিম হা/১৭১৬।

তাহ'লে কেন আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, মুজতাহিদের কখনও কখনও একটি ছওয়াব মেলে। তবে আমরা বলছি না যে, তিনি ভুল করেছেন? কেননা কেউ যদি বলে, 'অমুক ইমাম ভুল করেছেন' তাহ'লে কিছু লোকের জন্য সে কথা বরদাশত করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রবাদে আছে, 'যাঁতায় যাঁতায় মিল'। তাই আমরা বলছি, কথা বলতে এত ছলচাতুরী কেন? অথবা কেন আমরা এ কথা বলতে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ছি যে 'মুসলিমদের অমুক ইমাম একটি মাসআলায় অথবা একটি ইজতিহাদে কিংবা একটি সিদ্ধান্তে ভুল করেছেন, ফলে তিনি দু'টির বদলে একটি ছওয়াব পাবেন? প্রথমত কেন আমরা মূলেই ইমামের ভুল করার কথা বলতে পারছি না? দ্বিতীয়তঃ এক মাসআলার সঙ্গে আরেক মাসআলার সমন্বয়ের কথাও কেন বলতে পারছি না? যেই সমন্বয় আমাদের আলোচ্য ফিক্‌হী মাসআলাতে যরুরী?

পাঠক! এই আলেম যে পুস্তিকা উক্ত লেখকের লেখার প্রতিবাদে লিখেছেন, তা পড়লে আপনি এমন কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন না যে, উক্ত লেখক মুসলিমদের একজন ইমামের একটি মাসআলা বা রায়ের উপর নির্ভর করে ভুল করেছেন।

অথচ খোদ ইমামের কিছু কিছু অনুসারী সে আমলেই তাঁর রায়কে শারঈ দলীলের সঙ্গে যাচাই-বাছাই ও পরিশোধন করতে গিয়ে উক্ত মাসআলায় তাঁর প্রদত্ত রায় থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, ভুলের জন্য মাসআলাটিতে ইমামকে একটা ছওয়াবের মালিক গণ্য করেছেন এবং তাঁর মাযহাব ত্যাগ করে এ মাসআলায় ছহীহ হাদীছসমূহকে আমলের জন্য আঁকড়ে ধরেছেন। যেখানে তাঁর তৎকালীন অনুসারীদের অনেকেই তাঁর মত ত্যাগ করেছেন সেখানে আমরা কেন ঐ প্রতিবাদের পুস্তিকায় এ কথা পড়তে পাই না যে, ইমাম মহোদয় ছওয়াব পাবেন বটে, কিন্তু তিনি মদ পানের উক্ত মাসআলায় ভুল রায় দিয়েছেন এবং ইমাম মহোদয়ের রায়ের উপর ভিত্তি করে 'মাজাল্লা আল-আরাবী' পত্রিকার লেখকের সুনাহর উপর আপত্তি তোলায় কোন অধিকার নেই?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমরা হয়ে গেছি কউর। আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ফরযের তুলনায় ইমামদের পবিত্রতা ও সম্মান আমাদের

অন্তরে অনেক বেশী জেঁকে বসে আছে। ফলে আল্লাহর হুকুম লংঘন হয় হোক, কিন্তু ইমামদের হুকুমের নড়চড় করতে আমরা মোটেও আগ্রহী নই।

এদিকে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে নিম্নের যে বাণীটি বলেছেন তাতে কিন্তু আমরা সবাই আস্থাশীল। তিনি বলেছেন, **لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلِّ** ‘যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না এবং আমাদের আলেম বা বিদ্বানদের অধিকার সম্বন্ধে জানে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়’।^{১০} এ বাণীতে রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের খাছভাবে আলেমদের অধিকার জানতে বলেছেন। কিন্তু একজন আলেমের অধিকার ও মর্যাদা কি এত উঁচুতে যে আমরা তাঁকে নবুঅত ও রিসালাতের আসনে আসীন করব? আমরা কি তাকে আমাদের হাবভাবের ভাষায় নিষ্পাপত্বের মর্যাদা প্রদান করব? হাবভাবের ভাষা তো দেখছি এখানে মুখের ভাষা থেকে অধিক জোরালো!!

আসলে আমরা একজন আলেমকে সম্মান করব, তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করব এবং আমাদের সামনে দলীল প্রকাশিত হ’লে আমরা তার তাক্বলীদও করব। কিন্তু তাই বলে ঐ আলেমের কথা উপরে রেখে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা নীচে নামিয়ে দেওয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই। আমাদের এমন অধিকারও নেই যে, তার কথাকে রাসূল (ছাঃ)-এর কথার উপর অগ্রাধিকার দিব। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর বিদ্যায় পারদর্শী আলেমদের কারও কোন অস্বীকৃতি কিংবা আপত্তি নেই।

আমার প্রকাশিত আরেকটি পুস্তিকায় আমি মদ পান সংক্রান্ত এ দৃষ্টান্তটি আলোচনা করেছি। ঐ পুস্তিকা থেকে পাঠক একটা সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হ’তে পারবেন। সেও এই একই কথা। যেমনটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **مَا أَكْرَأُكُمْ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ**, ‘যার বেশী মাত্রায় পানে নেশা জন্মে তার স্বল্প মাত্রাও হারাম’।^{১১}

১০. ছহীহুল জামে’ হা/৫৪৪৩।

১১. আব্দাউদ হা/৩৬৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৩; ইরওয়া, হা/২৩৭৫।

বস্তুত ‘মাজাল্লা আল-আরাবী’ পত্রিকার লেখক ভুল করেছেন। তিনি যে ইমামের উপর নির্ভর করে কথাটি বলেছেন তিনিও ভুল করেছেন। আর কেউ যখন ভুল করে তখন আমাদের মনে তার জন্য কোন পক্ষপাতিত্ব জাগার কথা নয়। ভুল ভুলই, কুফর কুফরই, চাই তা ছোট করুক কিংবা বড়; নারী করুক কিংবা পুরুষ- তা সবই ভুল। কার থেকে তা প্রকাশ পেল তা নিয়ে ভুলের তারতম্য করা যাবে না।

বিবাহকে ঘিরেও এমন একটি আইনের দৃষ্টান্ত আছে। ফিক্বহের বই-পুস্তকে সে আইন অতীতে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। এমনকি ‘মুসলিম ব্যক্তিগত আইন’ (Muslim personal law) নামে যে আইন আজ মুসলিম দেশগুলোতে চালু আছে তাতেও বিবাহ কেন্দ্রিক ঐ আইন বলবৎ আছে।

আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, ‘মুসলিম ব্যক্তিগত আইন’-এর নামে আমাদেরকে যে সমস্ত আইন মানতে বাধ্য করা হচ্ছে সর্বসম্মত মতানুসারেই তাতে শরী‘আত পরপন্থী অনেক বিধান রয়েছে। তা সত্ত্বেও শরী‘আত পরিপন্থী সেসব বিধান ‘মর্যাদাবান ইসলামী আইন’(?) হিসাবে আমাদের মাঝে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ বিধান অনুসারেই কোন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজের ইচ্ছামত যে কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খোলাখুলি বলেছেন, **أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ** ‘যে নারীই তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজে নিজে বিবাহ করবে তার বিবাহ বাতিল; তার বিবাহ বাতিল; তার বিবাহ বাতিল’।^২ এখন এ হাদীছ অকার্যকর, কিন্তু উক্ত বিধান কার্যকর এবং তদনুসারে বিচার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, ‘হাদীছটি কি আপনি ছাড়া আর কেউ বোঝেনি?’ উত্তরে বলব, এই হাদীছ আরবী ভাষা ও তার রীতি-নীতি সম্বন্ধে নিজ যামানায় যিনি সবচেয়ে বেশী বুঝতেন সেই ইমাম শাফেঈ (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। এটা এমন কোন লোকের রায় নয়, যিনি মূলে আলবানী, আলবেনীয় হিসাবে পরিচিত। বরং এই আলবানী একটি হাদীছ পেয়েছে, আর পেয়েছে

একজন ইমামের এতদসংক্রান্ত উপলব্ধি যিনি কিনা কুরাইশ বংশীয় বনু মুত্তালিব গোত্রের সন্তান।

প্রশ্ন জাগে, এই ছহীহ হাদীছের সাথে যুক্ত ছহীহ রায়কে কেন অন্য একজন মুসলিম ইমামের রায়ের খাতিরে পরিত্যাগ করা হ'ল? হ্যাঁ, ইমামের ইজতিহাদকে আমরা ধারণ করি। কিন্তু সেই ইজতিহাদ তখনই মূল্য পাবে যখন তা কুরআন-সুন্নাহর নিষ্কলুষ নছের (text) সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

আমরা সবাই উছুলে ফিক্বহের বই-পুস্তকে ফক্বীহ ও উছুলবিদদের কথা পড়ি : إِذَا بَطَلَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَدَّ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ, 'যখন হাদীছ পাওয়া যাবে তখন যুক্তি বাতিল (অকার্যকর) হয়ে যাবে', إِذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ الْمُؤْمِنِينَ, 'যখন আল্লাহর দরিয়া আসবে তখন মা'কিলের দরিয়া বাতিল (অকার্যকর) হয়ে যাবে'^{১০}, لَا اجْتِهَادَ فِيهِ, 'নছ যেখানে মজুদ সেখানে ইজতিহাদ খাটানোর সুযোগ নেই'। এই সূত্রগুলোর প্রত্যেকটিই তত্ত্ব হিসাবে সুবিদিত। তাহ'লে কেন আমরা এই সূত্রগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সমন্বয়ের কাজে লাগাব না? এবং কেনইবা আমরা সুন্নাহ বিরোধী নানা মাসআলা সদাই আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকব?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতের যিল্লতির রোগ নির্ণয়ের পর দ্বীনের পথে ফিরে আসাকে ঔষধ হিসাবে নির্বাচন করেছেন। তিনি বলেন, حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَيَّ

১০. 'নাহরু মা'কিল' (মা'কিলের নদী) ইরাকের বছরায় অবস্থিত। ছাহাবী মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করে উক্ত নদীর নামকরণ করা হয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ)-কে বছরায় একটি নদী খনন করা এবং সেটি মা'কিল (রাঃ)-এর হাতে শুভ উদ্বোধনের নির্দেশ দেন। সেজন্য উক্ত নদীকে 'মা'কিলের নদী' বলা হয়। অতঃপর এটি প্রবাদে পরিণত হয়। বলা হয়, إِذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ الْمُؤْمِنِينَ, 'যখন আল্লাহর দরিয়া আসবে তখন মা'কিলের নদী বাতিল (অকার্যকর) হয়ে যাবে। আল্লাহর দরিয়া বলতে সমুদ্র, বৃষ্টি ও বন্যাকে বুঝায়। কারণ এগুলো আসলে সকল পানি ও নদীকে ছাপিয়ে যায় এবং সবকিছুকে প্রাবিত করে। কোন জিনিসকে তুচ্ছ গণ্য করার জন্য প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। যখন তার চেয়ে বড় কোন জিনিস চলে আসে (মায়দানী, মাজমাউল আমছাল প্রভৃতি)। উক্ত প্রবাদের মাধ্যমে শায়খ আলবানী (রহঃ) বুঝাতে চেয়েছেন যে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর দলীল মজুদ থাকতে রায়, ক্বিয়াস বা ইজতিহাদ কিছুই চলবে না। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।-গবেষণা বিভাগ।

دِينِكُمْ 'তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের মাঝে ফিরে আসবে'।^{১৪}
(ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না।) এখন 'দ্বীনের পথে ফিরে আসা' কি শুধুই মুখের কথায় হবে? নাকি আক্বীদায় ও আমলেও ফিরতে হবে?

নিশ্চয়ই অনেক মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। কিন্তু তারা এই দুই সাক্ষ্য বাণীর সঙ্গে আবশ্যিকভাবে জড়িত দাবীসমূহ পূরণে মোটেও তৎপর নয়। সে অনেক লম্বা কথা। ফলতঃ আজকের যুগে অনেক মুসলমান এমনকি যারা মুরশিদ হিসাবে খ্যাত তারা পর্যন্ত কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বিশদ হক আদায় করেন না। এ সম্পর্কে অনেক মুসলিম যুবক ও লেখক তাদের আলোচনা ও লেখনীতে জনগণকে সচেতন করে থাকেন। তারা বলেন যে, কালিমা শাহাদতের হক হ'ল: হুকুম চলবে কেবল আল্লাহর। হ্যাঁ, আমিও এ কথা খোলাখুলি বলতে চাই। তবে আমি মুসলিম যুবক ও লেখকগণকে এই সত্যের প্রতিও সচেতন করতে চাই যে, ইসলামের নামে জাগতিক যেসব আইন-কানূনের বাস্তবায়ন এবং আজকের চলমান সমস্যাদির সমাধান যেসব আইনে করতে চাওয়া হচ্ছে তার অনেকটাই 'হুকুম কেবল এক আল্লাহর জন্য' হওয়ার পরিপন্থী।^{১৫} আমি লক্ষ্য করছি যে, এই সব লেখকের অনেকেই যে বিষয়ে অন্যদের সচেতন করছেন তার সঙ্গে কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না। তাদের সচেতনতা তো 'হুকুম চলবে কেবল আল্লাহর' এ কথাকে ঘিরে। কিন্তু আল্লাহর হুকুমের অর্থ তো কুরআন ও সুন্নাহর হুকুম। (সুন্নাহকে বাদ দিয়ে কেবল কুরআনের হুকুম নয়। কিন্তু তারা যেন সুন্নাহকে বাদ দিয়ে কেবল কুরআনের হুকুমকে আল্লাহর হুকুম মনে করছেন।)

ভেবে দেখুন, যখন অমুক ক্যাফের থেকে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত একটি হুকুম প্রকাশ পায় তখন আমরা তাকে আল্লাহ বিরোধী হুকুম বলেই গণ্য করি। কিন্তু যদি ঐ হুকুমই কোন ভুলকারী মুজতাহিদের ইজতিহাদ থেকে প্রকাশ পায় তখন কি তা আল্লাহ বিরোধী হুকুম বলে গণ্য হবে না?

১৪. আব্দুদাউদ হা/৩৪৬২; ছহীহাহ হা/১১।

১৫. এখানে মাযহাবের ইমামের হুকুমের ভূমিকা থাকছে কি?-অনুবাদক।

আমি বিশ্বাস করি, এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। কেননা হুকুমের উৎস (হুকুমদাতা) যেই হোক না কেন, সে হুকুম যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বলে গণ্য হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে দূরে থাকা একজন মুসলিমের জন্য ফরয। তবে এখানে এই পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, আল্লাহকে অস্বীকার করে আল্লাহ বিরোধী হুকুমের কথা যে বলেছে, সে চিরজাহান্নামী কাফের। আর যে মুসলিম, কিন্তু ভুল করে তা বলেছে, সে তার ভুলের উপরও ছুওয়াব পাবে। যেমন ইতিপূর্বে ছহীহ হাদীছের বরাতে এ সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

তাহ'লে বুঝা গেল, এখন দ্বীন বুঝার রাস্তায় চেষ্টা-সাধনা করা এবং তদনুযায়ী চলার মাধ্যমে দ্বীনের দিকে ফেরা ওয়াজিব হবে। আর এই চেষ্টা-সাধনা ও চলা তখনই সম্ভব হবে যখন আজকের দিনে 'আল-ফিক্‌হুল মুকারিন' বা 'আল-ফিক্‌হুল মুকারান' (তুলনামূলক ফিক্‌হ) নামে আখ্যায়িত ফিক্‌হশাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয় করা হবে।^{১৬} সকলকে আবশ্যিকভাবে এই ফিক্‌হের পঠন-পাঠন করতে হবে। বিশেষত ফিক্‌হ ও হাদীছের আইনানুগ সার্টিফিকেটধারী বিশেষজ্ঞগণ তা ভালোমত অধ্যয়ন করবেন।

আবার আমরা যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক দেব তখন অবশ্যই সে রাষ্ট্রের একটা সুস্পষ্ট সংবিধান ও ততোধিক সুস্পষ্ট কানুন লাগবে। তাহ'লে কোন মাযহাবের উপর ভিত্তি করে আমরা সে সংবিধান রচনা করব? কোন মাযহাবের ভিত্তিতে সেই সাংবিধানিক আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া হবে?

বর্তমান যুগে কিছু মুসলিম লেখককে দেখা যায়, তারা কিছু কিছু কানুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন এবং তাদের কাম্য মুসলিম রাষ্ট্রে এই কানুনগুলো আবশ্যিকভাবে কার্যকর করতে হবে বলে দাবী করেন। কিন্তু আমরা এই কানুনগুলোকে আমাদের বর্ণিত 'তুলনামূলক ফিক্‌হ' এবং আমাদের কানুনের মূল উৎস 'কুরআন ও সুন্নাহ'-এর ভিত্তিতে লেখা হয়েছে বলে দেখতে পাই না। এসব লেখক কেবলই মাযহাব অধ্যয়ন করেছেন। ফলে কানুন নির্ধারণ করতে গিয়ে তারা নিজ মাযহাবের মাসআলাগুলো নকল করেছেন এবং

১৬. তুলনামূলক ফিক্‌হশাস্ত্রকে আরবীতে 'আল-ফিক্‌হুল মুকারিন' বা 'আল-ফিক্‌হুল মুকারান' বলা হয়। এই ফিক্‌হশাস্ত্রে বিভিন্ন মাসআলায় ইমামদের মতামত ও দলীলাদি তুলে ধরে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক-বৈঠিক তুলে ধরা হয়ে থাকে।-অনুবাদক।

সামনের দিনে শীঘ্রই যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হ'তে যাচ্ছে বলে তারা আশা করছেন, তাদের লিখিত এই কানুনই তার কানুন হবে বলে তারা তাদের রচিত গ্রন্থে তা স্থান দিয়েছেন। সুতরাং বাস্তবে এ কোন নতুন তত্ত্ব নয়; যেমন 'নেশা উদ্বেককারী পানীয়' (المشروبات المسكرة) পুস্তিকার লেখক নেশা সম্পর্কে নতুন কোন তত্ত্ব হাযির করেননি। নতুন যে তত্ত্ব আমরা আশা করছি তা এই যে, আমরা মাদকের অবৈধতা সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সচেতন করে তুলব। তবে কমপক্ষে এতটুকু বলা যায় যে, নেশার ক্ষেত্রে অন্য আরেকজন ইমাম সঠিক কথা বলেছেন। কেননা তাঁর কথা সুন্নাহ সমর্থিত। এ মত ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর। তাঁর মতে, যে নেশার দ্রব্য বেশী পরিমাণ পানে নেশা হয় তার অল্প পরিমাণ পানও হারাম। চাই তা আঙ্গুর থেকে তৈরি হোক কিংবা অন্য কিছু থেকে। কেননা হাদীছে এসেছে, 'যার বেশী পরিমাণ নেশার উদ্বেক করে তার অল্প পরিমাণও হারাম'।

এই যে লেখকের লেখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার লেখার একটি দফায় এসেছে: 'কোন মুসলিম কোন যিস্মী অমুসলিমকে হত্যা করলে বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে'। ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্রে এ কথা সুবিদিত। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি মত রয়েছে, যা এর বিপরীত। অর্থাৎ কোন মুসলিম কোন যিস্মী অমুসলিমকে হত্যা করলে বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে না। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ, 'কোন কাফিরের মোকাবেলায় কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না'।^{১৭} তাহ'লে কোন প্রেক্ষিতে এই খ্যাতিমান আলেম ও সমকালীন লেখক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের বিপরীতে গিয়ে কাফির হত্যার বিনিময়ে মুসলিম হত্যার বিধান ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত করলেন? আমি বিশ্বাস করি, এর কারণ, ঐ ব্যক্তি যেই ফিক্‌হের উপর প্রতিপালিত হয়েছেন সেই ফিক্‌হই কেবল অধ্যয়ন করেছেন এবং তাকেই জীবনের ব্রত বানিয়ে নিয়েছেন। তাহ'লে এই ব্রত অবলম্বনই কি দ্বীনের পানে ফেরা বলে গণ্য হবে? দ্বীন বলছে, 'কাফিরের মোকাবেলায় কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না'; কিন্তু মাযহাব বলছে, 'তার বদলে তাকে হত্যা করা হবে'।

১৭. বুখারী হা/৩০৪৭; মিশকাত হা/৩৪৬১; ইরওয়া হা/২২০৯।

অনুরূপভাবে ঐ একই লেখক তার উক্ত একই লেখার মধ্যে বলেছেন, কোন মুসলিম কোন যিম্মী অমুসলিমকে ভুলক্রমে হত্যা করলে তার দিয়াত বা রক্তপণ কি হবে? তারপর লিখেছেন, মুসলিমের দিয়াত আর তার দিয়াত এক সমান। কানুন বা বিধিবদ্ধ আইনও যেই মাযহাবের উপর নির্ভরশীল তার অনুসরণে এই একই কথা বলেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دِيَّةُ عَقْلٍ الْكَافِرِ نَصْفُ دِيَّةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ ‘কাফিরের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক’।^{১৮}

এক্ষেত্রে কি তবে আমরা মাযহাবের কথাকেই কানুন বানিয়ে নেব, নাকি তার বিপরীতে হাদীছের কথাকে?

বস্তুত দ্বীনে ফেরা অর্থ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফেরা। কেননা সকল ইমামের ঐক্যমতে কুরআন ও সুন্নাহই দ্বীন। এই দ্বীনই পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও ভুল পথে আটকে পড়া থেকে মুক্ত। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ ‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এই দু’টির উপরে থাকলে পরবর্তীতে তোমরা কখনই পথ হারাবে না। তা হ’ল: আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। আর এরা দু’টো কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না, যে পর্যন্ত না এরা হাওয়ের ধারে আমার সাথে মিলিত হবে’।^{১৯}

আমরা এ পুস্তিকায় এমন কিছু উদাহরণ পেশ করেছি যাতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানকালের আলেম বা বিদ্বানদের উপর কেবল দ্বীনের উল্লিখিত দু’টি মূল উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দ্বীন বুঝা ফরয। এর ফলে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে আল্লাহ কর্তৃক মুবাহ করার দাবী তুলে মুসলমানরা হারামকে হালাল করার দোষে দুষ্ট হবে না।

১৮. তিরমিযী হা/১৪১৩; ছহীহুল জামে’ হা/৩৩৯৭।

১৯. হাকেম হা/৩১৯; ছহীহুল জামে’ হা/২৯৩৭।

এবার দ্বীনে ফেরা নিয়ে আমার শেষ কথা :

যখন আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ইযযত লাভের আকাঙ্ক্ষা করব, আমাদের উপর চেপে বসা লাঞ্ছনা ও দুর্গতি থেকে রেহাই পেতে চাইব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা করব তখন শুধু চিন্তা-চেতনা ও বোধ-বুদ্ধির পরিশোধন এবং দ্বীনী বিদ্যায় পারদর্শী আলেম-ওলামা ও বিশেষ ফিক্‌হশাস্ত্রের (তুলনামূলক ফিক্‌হ) বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ইমামদের সঠিক মতামতসমূহ শারঈ দলীলাদির আলোকে জনগণের সামনে তুলে ধরাই যথেষ্ট হবে না, বরং এখানে চিন্তা-চেতনা ও বোধ-বুদ্ধির পরিশোধনের সাথে আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লাগবে। তা হ'ল আমল। কেননা ইলম বা বিদ্যা হ'ল আমলের মাধ্যম। সুতরাং কোন মানুষ বিদ্যা অর্জন করলেও এবং তার বিদ্যা খাঁটি ও নির্ভেজাল হ'লেও যদি সে তদনুযায়ী আমল না করে তাহ'লে স্বতঃসিদ্ধভাবেই বলা যায় যে, এই বিদ্যা কোন ফল বয়ে আনবে না। সুতরাং বিদ্যার সাথে আমলকে অবশ্যই যোগ করতে হবে।

এভাবে যে নতুন মুসলিম প্রজন্ম গড়ে উঠবে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সাব্যস্ত বিধি-বিধানের আলোকে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অবশ্যই দ্বীনী আলেমদের নিতে হবে। জনগণ বংশ পরম্পরায় যে বিবেচনা-বোধ ও ভুলের উপর রয়েছে তার উপর তাদের থাকতে দেওয়া আমাদের জন্য জায়েয হবে না। তাদের সে সকল বিবেচনা-বোধ ও ভুলের কিছু তো সকল ইমামের ঐক্যমতে নিশ্চিতই বাতিল, আবার কিছু আছে মতভেদপূর্ণ এবং তাতে যুক্তি, ইজতিহাদ ও রায়ের দখল রয়েছে। আর এই রায় ও ইজতিহাদের কিছু আবার সুন্নাহর পরিপন্থী।

সুতরাং এই বিষয়গুলো পরিশোধন এবং সেই পরিশোধিত পথে চলা যে ফরয, তা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলার পর নতুন প্রজন্মকে অবশ্যই এই ছহীহ ইলম বা বিদ্যার ভিত্তিতে তারবিয়াত করতে হবে। এই তারবিয়াতই হবে তাই যা আমাদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন বা নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ উপহার দিবে। তার পরেই না আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী হুকুমত বা রাষ্ট্র।

আমার বিশ্বাস মতে এই দু'টি আবশ্যিক বিষয় তথা 'ছহীহ ইলম' এবং 'ছহীহ ইলমের ভিত্তিতে ছহীহ তারবিয়াত' না হ'লে 'ইসলামী সমাজের নকশা' বা 'ইসলামী প্রশাসন' বা 'ইসলামী রাষ্ট্র' যাই বলি না কেন তা কয়েম হওয়া সম্ভব নয়।

ছহীহ ইলমের ভিত্তিতে ছহীহ তারবিয়াত যে কতখানি আবশ্যিক আমি তার একটা উদাহরণ টানছি: আমাদের সিরিয়াতে একটা ইসলামী দল আছে যারা চায় ইসলামের জন্য কাজ করতে, ইসলামী জাগরণ ঘটাতে এবং নিজেদেরকে ও নতুন প্রজন্মকে ইসলাম মুতাবেক প্রতিপালন করতে। কিন্তু আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে, এই সংস্কারকামীদের বেশীর ভাগেরই ইতিপূর্বে আমাদের উল্লেখিত নিরাপদ ও ছহীহ ধারায় ইসলামের ব্যাপক অধ্যয়ন নেই। তাদের জন্য এ অধ্যয়ন অত্যন্ত যরুরী। এই দলের অনেক মুসলিম যুবককে দেখি, তারা জুম'আর রাতে রাত জাগার জন্য জমায়েত হওয়ার জন্য একে অপরকে আহ্বান জানায়। আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য পারস্পরিক এ আহ্বান নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দর। কিন্তু যেহেতু তারা সুন্নাহ অধ্যয়ন করেনি, সুন্নাহ বোঝেনি এবং বুদ্ধি-বিবেচনা হওয়ার পর থেকে তারা এমন কোন বংশধারা পায়নি যারা তাদেরকে বাল্যকাল থেকে সুন্নাহ ভিত্তিক প্রতিপালন করতে পারে, সেহেতু একাজ করতে গিয়ে তারা সুন্নাহের বিরুদ্ধাচরণ করে বসেছে। এ বিষয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করছি। তিনি বলেছেন, لَا تَخْصُصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْصُصُوا يَوْمَ، 'রাত্রিকালে ছালাত আদায়ের জন্য তোমরা রাতগুলো থেকে জুম'আর রাতকে নির্দিষ্ট কর না এবং (দিবাভাগে) ছিয়াম পালনের জন্য দিনগুলো থেকে জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট কর না'।^{২০} বুঝে দেখুন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে আমাদেরকে জুম'আর রাত ইবাদতে জেগে কাটাতে নিষেধ করলেন সেখানে কিভাবে আমরা তার অন্যথা করছি? এর কারণ, আমাদের বিষয়টি মোটেও জানা নেই। কিন্তু আলেমদের তো বলা

২০. মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২; ছহীহুল জামে' হা/৭২৫৪।

দরকার ছিল যে, এ রাতে ইবাদতের জন্য জাগরণ জায়েয নেই। একটু আগে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ তার প্রমাণ।

প্রিয় পাঠক! আপনি এই ভালমনা যুবকদের অন্য এক গ্রুপকে পাবেন, তারা গান-বাজনা শোনা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে হালাল গণ্য করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন। গীত-বাদ্য শুনতে সাবধান করেছেন এবং যারা অসার ক্রীড়া-কৌতুকে মেতে থাকে ও গীতবাদ্য শোনে তাদের বানর-শুকরে রূপান্তরিত হওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে এই নতুন মুসলিম প্রজন্মকে কোন সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।^{২১}

এই নতুন প্রজন্মকে কোনটা জায়েয, আর কোনটা নাজায়েয তা শেখানো হয়নি এবং সেভাবে গড়ে তোলা হয়নি। তারা অনেক ধরনের মতামত পায় এবং সুবিধামত একটা মানে। উদাহরণস্বরূপ গান মুবাহ হওয়া সম্পর্কে ইমাম ইবনু হায়ম (রহঃ)-এর একটি পুস্তিকা আছে। দ্রুতই এ পুস্তিকা ছাপা হচ্ছে এবং জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে পুস্তিকাটি তাদের খেয়াল-খুশীর সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কিছু সংস্কারক ও সংশোধনকারী তো এ কথাও বলে থাকেন যে, ইনি তো যুগ যুগ ধরে ইমাম পদে বরিত এবং তাঁর এ ধরনের একটি মত রয়েছে। কাজেই আমরা গীত-বাদ্য শুনতে তাঁর তাক্বলীদ ও অনুসরণ করব। বিশেষত যখন এ মুছীবত ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। বুঝুন! অবস্থা এমন হ'লে সুন্নাতের স্থান দাঁড়ালো কোথায়? সুন্নাতের তো তাহ'লে একেবারেই দফারফা হয়ে গেল!

যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উপর ঘাঁটি গেড়ে বসা লাঞ্ছনার চিকিৎসা 'দ্বীনে ফেরা' নির্ধারণ করেছেন, তখন আমাদের উপর ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে আলেমদের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ মাফিক ছহীহ-শুদ্ধভাবে দ্বীন বুঝা এবং আমাদের নেককার ও পবিত্র নতুন বংশধরদের ছহীহ-শুদ্ধ দ্বীনের উপর লালন-পালন করা। প্রত্যেক মুসলমান যে সমস্যা নিয়ে নিরন্তর অনুযোগ করে তা থেকে মুক্তির এটাই পথ।

আমার খুব পসন্দের একটি বাক্য, বস্তুত যেন তা আমার বলা সকল কথার সার কথা, যা কিনা বর্তমান যুগের জনৈক সংস্কারকের উক্তি, আমার মনে বলে এ যেন আসমানী অহী, তা হ'ল, **أَقِيمُوا دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ فِي قُلُوبِكُمْ، تُقَمَّ لَكُمْ فِي، ه'ل**, 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের জনপদে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে' ।

আমাদের অবশ্যই দ্বীন ইসলামের ভিত্তিতে যেমন করে আমরা উল্লেখ করেছি তেমন করে আমাদের মনের সংশোধন করতে হবে। নিশ্চয়ই তা অজ্ঞতার ভিত্তিতে হবে না, বরং হবে ইলমের ভিত্তিতে। এমনি করে এক সময় আমাদের এই দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে।

উপসংহারে বলব, এই মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে যারাই শরীক হবেন তারা এবং ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ যেন ইসলামের বর্ণনা কুরআন ও সুন্নাহতে যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবে বর্ণনা করেন এবং নতুন বংশধরদের তদনুযায়ী প্রতিপালন করতে এগিয়ে আসেন। সেই সঙ্গে যেন বাড়িয়ে দেন সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার হাত। এ হ'ল উপদেশ। আর উপদেশ মুমিনদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفر لي ولوالدي وللؤمنين يوم يقوم الحساب -

‘হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৩ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডব্লিউরেট থিসিস)। ২৫০/= ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। ৬. নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। ৭. নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। ৮. নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। ৯. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। ১০. ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১১. ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। ১২. সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। ১৩. তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১৪. জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। ১৫. হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ১৬. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১৭. জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১৮. দিগদর্শন-১ (৮০/=)। ১৯. দিগদর্শন-২ (১০০/=)। ২০. দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। ২১. আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। ২২. ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। ২৩. ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। ২৪. আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। ২৫. মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। ২৬. শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। ২৭. আশুরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। ২৮. উদাত আহ্বান (১০/=)। ২৯. নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। ৩০. মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২৫/=)। ৩১. তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। ৩২. হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। ৩৩. ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। ৩৪. ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ৩৫. হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। ৩৬. বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। ৩৭. নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। ৩৮. সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। ৩৯. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। ৪০. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। ৪১. মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। ৪২. মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ৪৩. কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। ৪৪. বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। ৪৫. মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। ৪৬. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। ৪৭. আরব বিশ্বে ইফ্রাঙ্গিলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমুদ শীছ খাত্বাব (৪০/=)। ৪৮. অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। ৪৯. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। ৫০. তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। ৫১. তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। ৫২. এক্সিলেন্ট (২০/=)। ৫৩. বিবর্তনবাদ (২৫/=)। ৫৪. ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। ২. কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেলে কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। ২. সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। ২. মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)।

৩. ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। ৪. ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। ৫. মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। ৬. ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। ৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩. শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। ২. যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। ৩. নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। ৪. মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। ৫. প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। ৬. আল্লাহর উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। ৭. ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। ৮. ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। ৯. চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাঈয়িস (২৫/=)। ১০. শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। ১১. আত্মসমালোচনা (৩০/=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাদ্দি (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজ্বুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আস্থান (৮০/=)। ২. আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাদ্দি (৫০/=)। ২. যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। ৩. ইসলামে তাক্বুলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাদ্দি (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। ২. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়ের যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১. জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। ২. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। ৩. জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। ৪. ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। ৫. দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। ৬. ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। ৭. ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। ৮. দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। ৯. দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। ১০. দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। ১১. সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। ১২. সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। ১৩. সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। ১৪. সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। ১৫. ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৭টি।